বিভূতিভূষণের সাহিত্যে অমঙ্গলচেতনা

ভবানী - প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এযেন আরেক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নন, প্রকৃতির প্রেমে মগ্ন, যাঁকে দেখি বারাকপুরে ঝড়ে ভেঙে পড়া একটি আমগাছের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছেন, 'সলতেখাগী গাছটা ভেঙে গেল! ওযে আমার জীবনের সঙ্গে জড়ানো নানা দিক থেকে। ওরই তলায় সেই ময়নাকাঁটার ঝোপটা, যার সঙ্গে আবাল্য কত মধুর সম্বন্ধ।' (উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। কী করব, এ একজন লেখক, যাঁর লেখা পড়তে আরম্ভ করলে থামা যায় না।) 'সলতেখাগীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে গিয়ে জ্বালানী করবে এবার হাজারী কাকা! সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপার নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি।' ('উর্মিমুখর')

'পথের পাঁচালী' -তেও বিভূতিভূষণ সলতেখাগীর কথা লিখেছেন। আবার সেই বইয়ে ইন্দির ঠাকরুণের কথ্য লিখতে তাঁর হাত কাঁপেনি, তাঁর আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি চোখের জলে জাপসা হয়নি। এই অন্য বিভূতিভূষণই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। কিনতু তাঁর কথা পরে। তার আগে, আমরা বিভূতিভূষণ বলতে যাকে চিনি তাঁর কথাই আরেকটু বলে নিই। 'বেলডাঙার ওপারের বাঁশবনের াথার ওপর কালবৈশাখীর মেঘের নীল নিবিড় রূপ দেখে ধমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কোথা থেকে আবার এক সারি বক সেই সময় নীল মেঘের কোলে উড়ে চলেছে—সে কী অপরূপ রচনা! এদিকে মনে ভয় হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, ঝড় মাথায় মাঠের মধ্যে থাকা ভাল নয়, অথচ যাবো তার সাধ্যি কি! পা কি নাড়তে পারি?' ('উর্মিমুখর')

সেই কালবৈশাখীর মেঘের মতোই ঘনকৃষ্ম অকল্যাণ যখন নেমে আসে মানুষের জীবনে, তাকে দুর্ভেদ্য তমিস্রায় আচ্ছন্ন করে, সেদিক থেকেও বিভূতিভূষণ চোখ ফেরাতে পারেন না। এক দিকে অপু এবং দুর্গা, আরেক দিকে ইন্দির ঠাকরুণ ও সর্বজয়া, জীবনের রহস্য বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে এই দু'টি মেরুকেই আলিঙ্গন করেছে।

ইন্দির ঠাকরূণের জীবনের শেষ দিনটিতে অমঙ্গলের সেই মুর্তি দেখে আমাদেরও আন্তরাত্মা ভরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়: দুঃখ নয়, সমবেদনা, সহানুভূতি নয়, আক্রোশ, কিংবা ক্ষোভ নয়, একেবারে বিশুদ্ধ ভয়। এ কী মুর্তি মানুষের! নিষ্ঠরতা, নির্মমতা, কঠোর হৃহয়হীনতা আমাদের জীবনে যেমন তেমনি আমাদের সাহিত্যেও কম নেই। শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' -তে শিশুর মতো সরল ও নিষ্পাপ প্রিয়নাথ, জগতে তার একমাত্র সহায় কন্যা সন্ধ্যার হাত ধরে গ্রামের মোড়ল গোলাপ চাটুয্যের বৈশাচিক লালসার শিকার অসহায় সন্ধ্যার পাশে এসে দাঁড়াল যখন, ওয়ার্ডওয়ার্থ -এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে:

Have I not reason to lament/ what man has made of man?

কিন্তু একে একেবারে মূর্তিমতী অমঙ্গল, evil, আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল:

'বুড়ি হাসিয়া বলল, —ও বৌ, ভাল আছিস? এই এলাম এ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এই বয়সে—তাই বলি—

সর্বজয়া আগাইয়া আসিয়া বলল, —তুমি এ বাড়ি কী মনে করে?

তার ভাবভঙ্গী ও গলার স্বরে বুড়ীর হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলল —এ বাড়ী আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না— সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েছি— ফের কোন মুখে এয়েচ?

বুড়ী কাঠের মত হইয়া গেল। মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল—ও বৌ, অমন করে বলিস নে— একটুখানি ঠাঁই দে আমাদের— কোথায় যাব াার শে, কালডা বল দিকিনি—তবু এই ভিটেটাতে।' বুড়ী জানে না কে দাঁড়িয়ে তার সামনে। ক্রিশ্চান ধর্মবিশ্বাসে শয়তান, Satan, হচ্ছে অমঙ্গলের অধিপতি Prince of Darkness, দয়া, মায়ার সে চিরশত্রু। তার যারা উপাসক, Satanism যাদের ধর্ম, তারা তাদের উপাসনা - স্থলে ক্রুস চিহ্নটিকে উল্টো করে স্থাপন করে, অর্থাৎ তাদের ধর্ম প্রেমের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সাধারণ দরিদ্র ঘরের এক গৃহবধূ, দুটি সন্তানের পরম স্নেহময়ী জননী, তার মধ্য দিয়ে, ইন্দির ঠাকরুমের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন করে আত্মপ্রকাশ করল অমঙ্গলের এমন এক রূপ, যা তার অত দুঃখের জীবনেও সে কখনও দেখেনি, যা তার বোধশক্তির অতীত, যা তাকে এমন এক অজ্ঞেয় রহস্যের সামনে নিয়ে এসে হাজির করল, যার বন্ধ দরজায় হাজার করাঘাত করলেও কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। সে জানে এই অভাবের সংসারে সে গলগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয় সে জানে, তার ছোটখাটো আশা - আকাঙ্ক্ষা, তার অতি নগণ্য সব হৃদয়বৃত্তি, এ -সবের কোনও মূল্য নেই এ সংসারের গৃহিণীর কাছে, তবু সর্বজয়া তো ইন্দির ঠাকরূণের অত আদরের অপু-দুর্গার মা। কিন্তু এ কে! ইন্দির ঠাকরুণ তার দুঃখের জীবন অন্তিমলগ্নে মনুষ্য নামক জীবের সামগ্রিক অসহায়তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সে দেখে, অমঙ্গলের সেই ঘনীভূত সত্তা এক সামান্য গ্রাম্য গৃহবধূর মূর্তি ধারণা করেছে। এ সর্বজয়া নয়, এ ঘনীভূত evil।

বিভূতিভূষণ বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, একে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা, এর আবির্ভাব যখন যেখানে ঘটে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমরা শুধু চেয়ে দেখতে পারি। যেমন তাজমহল আমরা শুধু চেয়েই দেখতে পারি, ভাবতে পারি, 'এ কি সম্ভব?' তাজমহল যেমন সুন্দরের এও তেমনই অসুন্দরের, অশুভের এক অবিশ্বাস্য প্রকাশ।

এ কোনও ব্যাখ্যা দেয় না, কোনও কৈফিয়ৎ দেয় না, এ যা এ তাই। যা কল্যাণকর, যা মঙ্গলদায়ক, যা শুভ, এ তার চিরশত্রু। ম্যাকবেধ নাটকের তিন ডাইনির সমবেত সংগীতে এই অমঙ্গলের জীবনদর্শনই ঘোষিত: 'Fair is foul and foul is fair,' কাজেই আমাদের আর্তি, আমাদের মর্মান্তিক বেদনার সামনে এ নিরুত্তর। ম্যাকবেথ নাটকের উল্লেখ করলাম, কিন্তু শেক্সপিয়রের যে - নাটকে এই অমঙ্গল নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করেছে সেটি হল ওথেলো। বিখ্যাত শেক্সয়ির বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক চেম্বারস বলেছেন, বাহ্যত ইয়েগো মনুষ্যাকৃতি হলেও, আসলে সে মূর্তিমান evil, 'The incarnation of the forces of evil, of this devil himself. তার motiveless malignity'র কথা বলা হযেছে। ওথেলো ও ডেসডিমোনার রচিত প্রেমের

স্বর্গকে বিষিয়ে তোলা, তাদের ধ্বংস করাতেই তার চরিতার্থতা। যে motive -এর কথা ইয়েগো বলেছে সেটা অতি অকিঞ্চিৎকর।

গৌরকিশোর ঘোষের একটি ছোট গল্প আছে 'প্রশ্ন' নামে। উত্তমপুরুষে লেকা কাহিনিটি বলেছেন এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের একজন বড় অফিসার। তাঁর কাছে এসেছেন তাঁর এক বেকার বাল্যবন্ধু, অনেক দিন থেকে তার বড়ই দুরবস্থা, বড় অনটন। এসেছে বন্ধুর কাছে কিছু সহায়তা, একটু আনুকুল্যের প্রত্যাশায়, যদি কিছু একটা কাজ জুটিয়ে দেন। সেই বড় কোম্পানির বড় কর্তা নিজেই বলেছেন, তিনি তাকে কোনওরকমভাবে এতটুকু সাহায্য করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন। এমনকী সেই পথক্লান্ত ক্ষুধার্ত বাল্যবন্ধুকে এক কাপ চা ছাড়া আর ছিু খাবার আনিয়ে দিতেও তিনি রাজি নন। বললেন, 'এটা কাজের জায়গা, রেস্টোরান্ট নয়।'

এই গল্পটা পড়ে আমি গৌরকিশোরকে বোকার মতো প্রশ্ন করেছিলাম, একজন বন্ধুর প্রতি কোনও মানুষ যে এ-রকম আচরণ করবে, তার একটা কারণ তো চাই ? গৌর কোনও উত্তর দিলেন না, আমি পরে বুঝলাম, জীবন, জীবনের ভাল অথবা মন্দ, কোনও উত্তর দেয় না, সেইটাই জীবনের গল্প। অর্থাৎ জীবন evil-এর কোনও অজুহাত থাকে না। বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে-উপন্যাসে একাধিকবার এই evil-কে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দৃষ্টিপ্রদীপ -এ একটি ছোট্ট ঘটনায় দেখি অমঙ্গলের আরেকটি প্রকাশ যা, মনে হয় যেন, ক্ষণিকের জন্য মানুষের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে অসাড় করে দিল।

'পাড়ার চার-পাঁচজন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যিখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকছে, শিকারের গল্প করচে। বাবাও খুব বকচেন। নিতাই আমাকে বাবার সামনে যেতে বারণ করাতে আমি আর দাদা পেছনেই রইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূরে গেল, একটা বড় বাগান পার হল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েছে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই। পৌঁছলাম। নিতাই বলল—ওই তো পাড়াগাঁয়ের জলা—চাল, বিলের ওপারে নিয়ে যাই— ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাত্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না— গেল শুধু সিঁধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে, চল্ পালাই — তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেছি— বসে বসে টানছে। চল, ছুটে পালাই।'

বাবা পাগল, ছেলে তাকে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, গ্রামের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বাইরে রেখে গেল, যাতে পাগল বাবা আর বাড়ি ফিরতে না পারে। বাবা বাঁওরের ধারে বসে বসে সিগারেট টানতে লাগল। ছেলের বন্ধু বলল চল, ছুটে পালাই।

অমঙ্গলের শনির দৃষ্টি যেখানে পড়ে স্নেহ, মমতা, পিতা-মাতা-সন্তানের বন্ধন, সমস্ত শিশির বিন্দুর মতো উড়ে যায়। তখন তার জন্য আপনি কাকে দায়ী করবেন, কাকে দোষ দেবেন ? সর্বজয়ার দারিদ্রকে ? জিতুর বাবার ব্যর্থ জীবনকে ? এসব তো সংসারে আছেই, কিন্তু অমঙ্গলের যে ভয়ঙ্কর মুখ এ-সবের মধ্য দিয়ে আমাদের চোখে দেখা দেয় এই দারিদ্র, এই ব্যর্থ জীবনের মধ্যে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নেই। এ-সব উপলক্ষ মাত্র, Evil -এর আবির্ভাব মানুষের জীবনে তার পরেও একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যই থেকে যায়।

'তিরোলের বালা' নামক ছোটগল্পে বিভূতিভূষণ অমঙ্গলকে তার সর রকম আনুষঙ্গিকতা থেকে বার করে নিয়ে এসে একেবারে একটি অনন্যনিরপেক্ষ বাস্তবতা হিসাবে উপস্থিত করেছেন।

'চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ধপধপে ফর্সা রঙ, বড় বড় চোখ, ঠোঁটের দুটি প্রান্ত উপরদিকে কেমন একটু বাঁকানো, তাতে মুখশ্রী আরও কি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

সে আর তার দাদা যাচ্ছে তিরোলে, পাগলাকালীর বালা মেয়েটিকে পরানো হবে বলে। 'চুপ করে আছে এখন প্রায় দু মাস, কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে।'

যে-গ্রামে তারা গিয়ে উঠল, সেখানে একটি গৃহস্থের বাড়িতে একটি ঘরে তারা ভাইবোন আশ্রয় নিল, পাশের ঘরে এ কাহিনির কথক।

পরদিন সকালে সে ভাইবোনের উঠতে দেরি দেখে তাদের জানালা দিয়ে দেখল, 'ঘরে এত রক্ত কেন ? পূর্ণিমার দাদা চৌকির ওপরকার বিছানায় উপুর হয়ে কেমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে, বিছানা রক্তে ভাসছে, মেঝেতে রক্ত গড়িয় পড়ে মেঝে ভাসছে— আর পূর্ণি দেওয়ালের ধারে মেঝের ওপর পড়ে আছে, জীতি কি মৃতা বুঝতে পারলাম না।'...

'পূর্ণিমার দাদার গলায়, কাঁধে ও হাতে সাংঘাতিক কোপের দাগ, আর রাত্রে কুটনো কোটার জন্যে একখানা বড় বঁটি গৃহস্থেরা দিয়েছিল, সেখানা রক্তমাখা অবস্থা বিছানার ওপাশে পড়ে।'

'হতভাগিনী রাত্রে কোন সময়ে এই বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়েছে, নিজের হাতে ভাইকে খুন করে ঘরের মেঝেতে অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। দিব্যি শান্ত নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোচ্ছে... ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখাচ্ছে কি সুন্দর, আরও ছেলেমানুষ, নিষ্পাপ সরলা বালিকার মত।'

বিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু কী করে একটা ঘটনা ঘটল, তার ব্যাখ্যা আর, কেন ঘটল, তার ব্যাখ্যা এক নয়।

আমরা শুধু দেখি কী ঘটে ? বিভূতিভূষণ তার লেখায় এই ঘটনার, মানুষের জীবনের এই অমঙ্গলের রূপটাই, রূপশিল্পী হিসাবে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন।